আমিনুল ইসলামের কবিতায় বরেন্দ্র জীবন ও জনপদ

মোঃ ফখরুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদ বরেন্দ্র। কথাসাহিত্যে বরেন্দ্র জনপদ নানামাত্রায় উদ্ভাসিত। কিন্তু কবিতায় তেমন করে এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। বক্ষ্যমাণ কবি আমিনুল ইসলামের (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থ থেকে বরেন্দ্রভূমির উপস্থিতি অনুসন্ধান করা হয়েছে। কবি নানা উপলক্ষ্যে বরেন্দ্রভূমিকে ও তার নানা অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গকে অঙ্গীকার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে বরেন্দ্রের অতীত ঐতিহ্য, লোকসম্পদ ও জনজীবনের নানান বাস্তবতা উঠে এসেছে। বরেন্দ্রের এসব উপাদান অনুসন্ধানের মাধ্যমে বরেন্দ্রভূমিকে কবি কীভাবে তাঁর কাব্যে ধারণ করেছেন, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।]

সংকেত শব্দ : আমিনুল ইসলাম, বরেন্দ্রভূমি, পুণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর।

বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র অন্যতম। ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এ-অঙ্গন প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত। প্রাচীন বাংলার রাজধানী হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধনের পরিচয় বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনি ও ইতিহাসবেত্তাদের লেখায় পাওয়া যায়। করতোয়া তীরবর্তী বর্তমান বগুড়া প্রাচীন পুন্-নফ-তন তথা পুণ্ড্রবর্ধন। বরেন্দ্রভূমির ভৌগোলিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন:

> বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড়, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকা প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা যায়। [...] এ ভূমির সব মাটিই গৈরিক বা লাল নয়। উত্তরবঙ্গের জনবিরল গৈরিক মাটির অনুর্বর এলাকা ও বনভূমি বরেন্দ্রীর পুরাভূমি। এই ভূমিই বরেন্দ্রীর কেন্দ্রস্থল। এছাড়াও ঘনবসতিসমৃদ্ধ পদ্মা, আত্রাই, মহানন্দা, টাঙ্গন, করতোয়া, কোশির জলধারা ও পলিমাটি গঠিত নব্যভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। নব্যভূমির এলাকাটিই সুজলা, সুফলা, জলীয় ও শ্যামল। (নীহাররঞ্জন, ১৪০০ : ১১৬)

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য নিদর্শনে বরেন্দ্রভূমির উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। *চর্যাপদ* ছাড়া *মহাভারত*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, *ভবিষ্যপুরাণ* এবং মিনহাজ-ই-সিরাজের *তবকাত-ই-নাসিরী* প্রভৃতি গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমির উল্লেখ রয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত *দিগ্বিজয় প্রকাশ* গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমির অবস্থান বর্ণিত হয়েছে এরূপ:

> পদ্মানদ্যা পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
> বরেন্দ্রসংজ্ঞাকো দেশো নানা নদ নদী যুতঃ।।
> শতার্দ্ধযোজনৈর্যুক্ত দেশোদর্ভাদি সংযুতঃ
> উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে।।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অর্থাৎ পদ্মানদীর পূর্বধারে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে নানা নদ-নদীযুক্ত বরেন্দ্রভূমি উপবঙ্গের নিকট এবং মলদের দক্ষিণে অবস্থিত যা শতার্ধ যোজন বিস্তৃত। (নীহাররঞ্জন, ১৪০০ : ১১০)

প্রাচীন বাংলার রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, সাহিত্য এককথায় সংস্কৃতির সকল অঙ্গনেই এই ভূগোলের গৌরবদীপ্ত, উজ্জ্বল সুকীর্তির স্বাক্ষর আজও বর্তমান। এর বৈচিত্র্যপূর্ণ জনজীবন, সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতি, অসংখ্য প্রাণপ্রবাহী নদ-নদী, বিশেষ ধরনের ভূ-প্রকৃতি অন্যান্য অঞ্চল থেকে একে আলাদা করেছে। সঙ্গে আছে নানা বিদ্রোহের সূতিকাগার হিসেবে খ্যাতি। বরেন্দ্রর অতীত ইতিহাসে যেমন রয়েছে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন তেমনি সাম্প্রতিককালে সে ধারায় যুক্ত হয়েছে কানসাট পল্লি-বিদ্যুৎ আন্দোলন ও ফুলবাড়ী কয়লাখনি আন্দোলন। বরেন্দ্রের পটভূমিতে রচিত বেশকিছু উপন্যাসের কথা আমরা জানি। বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়—সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) *বিদ্রোহী কৈবর্ত*, শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, সরদার জয়েনউদ্দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *নীল রঙ রক্ত*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা*, আবু বকর সিদ্দিকের (১৯৩৬-২০২৩) *খরাদাহ* প্রভৃতি।

সুযোগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কবিতায় বরেন্দ্রভূমির ছবি উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতায় তেমনভাবে বরেন্দ্রের কথা উঠে না আসলেও যা পাওয়া গেছে তা হতাশাজনক নয়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কবি আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) *সোনালী কাবিন* শিরোনামা সনেটগুচ্ছের কথা। তাঁর এই কবিতায় বাঙালির আত্মপরিচয়ের সুলুক-সন্ধানসূত্রে বরেন্দ্রের প্রাচীন নৃ-গোষ্ঠীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। পুণ্ড্র-করতোয়া উচ্চারণ-ধন্য একটি সনেটের কিয়দংশ—

> যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো মানিনী
> একদা তারাই জেনো গড়েছিল পুণ্ড্রের নগর
> মাটির আহার হায় গেছে সব, অথচ জানিনি
> কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়। (আল মাহমুদ, ২০১৯ : ১০৩)

পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য অঙ্গীকার করেই কবি আমিনুল ইসলাম বরেন্দ্রকে এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। বরেন্দ্রকে তিনি তাঁর মননের উৎসভূমি বলে চিহ্নিত করেছেন। কবি যে ভূগোলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন, কবির মানস গঠনে তার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। গৌড়-বরেন্দ্রের কবি আমিনুল ইসলামের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। গৌড়জনের রুচি, সাহস, বৈদগ্ধ ও অন্যান্য গুণ আমিনুল ইসলামের কাব্যেও সুপ্রত্যক্ষ। তাঁর কবিতায় গৌড়-বরেন্দ্রের কথা প্রায় ঘুরে-ফিরে আসে। রাজশাহীর পদ্মার পাড়, রাজশাহী শহরের সোনাদিঘির মোড় এবং আরডিএ মার্কেট, তানোর উপজেলার আয়ড়ার মোড়, কাকনহাটের পানিহার লাইব্রেরি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, নকশিকাঁথা-সুজনী, আমবাগান, রেশমশিল্প এবং আলকাপ-গম্ভীরা গান, নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, কুসুম্বা মসজিদ, দিব্বক স্তম্ভ, রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) স্মৃতিধন্য পতিসর, অতীশ দীপঙ্কর, নাটোরের বনলতা সেন এবং রাণী ভবানী, বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং বেহুলার ভিটা, দিনাজপুরের কান্তজীউর মন্দির এবং রামসাগর, গাইবান্ধার গাজীপিরের ভিটা, বিরাটের গাই, কার্তিকের মঙ্গা, রংপুরের ভাওয়াইয়া গান, চিলমারীর বন্দর, লোকসঙ্গীতসম্রাট আব্বাসউদদীন (১৯০১-১৯৫৯), কৃষকনেতা নুরলদীন (অজ্ঞাত -১৭৮৩), ফকির বিদ্রোহের নেতা মজনু শাহ (অজ্ঞাত-১৭৮৭), বরেন্দ্রর নদ-নদী—পদ্মা, মহানন্দা, করতোয়া, আত্রাই, তিস্তা, চলনবিল এবং রাজশাহী অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের কথা বারবার চিত্রকল্প, উপমা, রূপক, প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস—পাল শাসন, কৈবর্ত রাজ্য, সেন রাজাদের শাসন, সুলতানী আমল,

ইংরেজ আমল, পাকিস্তানি আমল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি স্থান লাভ করেছে তাঁর কবিতায়। এসেছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কৈবর্ত, জেলে, মালো প্রভৃতি আদি জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। আমিনুল ইসলামের কবিতায় অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গ হিসেবে তাঁর নিজস্ব মাটির অর্থাৎ জন্মস্থানের কথা উচ্চারিত হয়েছে আত্মজৈবনিক ঢঙে—

ও পদ্মা! ও আমার স্বপ্নের ভূমিলিপ্সু পড়শী!
ওই হাঙরপেটটা চিরে একবার দেখাও তো দেখি—
কোথায় আমার সেই মার্বেল খেলার গলি!
তোমার রূপান্তরের চুল্লির কোন তাকে রেখেছো
ঘুটনিপাড়া-বাবলাবোনা-পাকা-নারায়ণপুর আর
গুমানির কবিগানে মুখরিত পৌষমেলার রাধাকান্তপুর!
এই দ্যাখো–আজও এই মনে এমবোস সীলের মতন
পাটক্ষেতের সেই শিহরিত স্মৃতি! (আমিনুল, ২০০৪ : ১৩)

ঐতিহাসিক জনপদ বরেন্দ্রের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বর্তমানের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া ও পাবনা জেলা। পদ্মা-মহানন্দা-আত্রাই এ অঞ্চলের প্রাণ-প্রবাহী তিন স্রোতস্বিনী। লাল-রুক্ষ মাটির ছোট ছোট টিলাসদৃশ বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত যেমন এর এক অংশের চিত্র, ঠিক অন্য অংশে রয়েছে নদীপ্লাবিত ভূভাগ যা দিয়াড় নামে পরিচিত। আর আছে চর এলাকা। কবি আমিনুল ইসলামের কাব্যের ভূ-ভাগের সীমানাও এইটি।

বাঙালির ইতিহাসকে কেবল পরাধীনতার ইতিহাস বলেই মনে হয়। পরজাতি কর্তৃক শোষিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হওয়া যেন আমাদের বিধিলিপি ছিল। ব্যবসা, ধর্মপ্রচার কিংবা লুণ্ঠন যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন বাংলায় বিদেশিদের আগমন ঘটেছে অনেককাল আগে থেকে। ফলে 'শক-হুন-দল-পাঠান-মোগল' একদেহে লীন হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক সত্যের কথা কবি আমিনুল ইসলাম লিখেছেন:

একদিন বরেন্দ্রের ভাতের সুঘ্রাণে সমুদ্র জঙ্গল ভেঙে
এসেছিল মুগ্ধপায়ে তুর্কী-চীন-মগ-আরবি-মঙ্গল-তাতার;
আজো সেই মুগ্ধছাপ গাঙেয় তল্লাটজুড়ে রয়েছে নিভৃতে; (আমিনুল, ২০০৪ : ১৮)

গৌড়-বরেন্দ্রের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করেছেন কবি। লোকসম্পদে সমৃদ্ধ এ অঞ্চলের নিজস্ব লোকআঙ্গিক আলকাপ, গম্ভীরার সঙ্গে পুঁথিপাঠ, কবিগান, রাখালিয়া বাঁশি আর কিংবদন্তির কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গেই তাঁর কবিতায় মাঝেমধ্যেই স্থান পায়। বরেন্দ্রর কৃষক-শ্রমিক-শ্রমজীবী মানুষের অবসর বিনোদনের মাধ্যম এসব লোকসংগীত—বিশেষ করে আলকাপ ও গম্ভীরা দুই জনপ্রিয় লোকআঙ্গিক। দলগত পরিবেশনায় এইসব মানুষই সাজে কবি-অভিনেতা দলপতি সরকার। আলকাপ গানের সরকার, গম্ভীরার নানা-নাতি-দোহার, পুঁথিপাঠ, পৌষমেলা, কবিগানের প্রবাদপুরুষ গুমানি এইসব বিষয় প্রায়শই স্মৃতিবাহিত হয়ে উঠে আসে আমিনুল ইসলামের কবিতায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য:

গোড়ানাশা পদ্মা, তোমার জলবিশ্বায়ন সিঁদুর মোছার মতন
ভাসিয়ে নিয়েছে সব!
পুটু সরকারের আলকাপের মঞ্চ,
সাফু চাচার পুঁথিপাঠের আসর,
ম্যাড়াতলার বিল,
গোঠের রাখাল সামশুলের ষোলরইশ্যার মাঠ,
বাঁশি, কে বলিতে পারে আজ
রোদেলা পরাণ ছুঁয়ে বটের ছায়ার মতো ছিল এতোদিন! (আমিনুল, ২০০৪ : ১৮)

বাংলার জলময় ভূগোলে বরেন্দ্র অনেকখানি রুক্ষ। প্রকৃতির এই রুক্ষতাই বাড়িয়ে দেয় নদীতৃষ্ণা। বরেন্দ্রে খুব বেশি নদী নেই। উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে রয়েছে মহানন্দা, আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, ইছামতি, বারনই, ছোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, নাগর, শিব, বড়াল, নাগর, পাগলা প্রভৃতি। নদী ব্যতিরেকে বরেন্দ্রসভ্যতাকে কল্পনা করা যায় না। উল্লেখযোগ্য সমস্ত নদীকেই পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়: পদ্মা, আত্রাই, মহানন্দা, পুনর্ভবা, করতোয়া, তিস্তা। জলজীয়া প্রাণ কবির একটি কাব্যের নাম *মহানন্দা এক সোনালি নদীর নাম*। নাম কবিতায় কবি 'মহানন্দাকে প্রাণের দোসর' বানিয়েছেন, ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে তাকে বর্ণনা করেছেন। সেই নদীসূত্রে এসেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্য আম, কাসাঁ, রেশম প্রভৃতির কথা। স্বর্গের অলকানন্দার সঙ্গে তুলনা করেছেন বরেন্দ্রের মহানন্দাকে; অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করে কবি লিখেছেন:

> এই যে মহানন্দা– দেবরাজের বর ছিল কি না কে জানে!
> এই জলের আরশীতে বিম্বিত মহাজীবনের জলছবি।
> ওই যে বারঘারিয়ার ঘাট– আজ মাঝিশূন্য, একদিন ওই ঘাটে
> এসে থেমেছিল তুর্কীদের ঘোড়া সাম্যের সোয়ারি বয়ে কাঁধে;
> আর নক্ষত্রের মতো হেসে উঠেছিল প্রাকৃত নারীর চোখ!
> এই জলেই মুখ দেখে আপন, তলোয়ার রেখে জমিনে
> মাটি চুমেছিলেন সুলতানের সেনাপতি। (আমিনুল, ২০০৪ : ৬৪)

তারপর এই ভূমি চাক্ষুষ করেছে নীলকরদের অত্যাচার, জমিদারদের উৎপীড়ন, ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন, দেশভাগ এবং পাকিস্তানি সামরিক দশক, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। কবি আমিনুল ইসলাম ইতিহাসের এসব ঘটনাকে যখন তাঁর কবিতায় ঠাঁই দেন, তখন তিনি তাঁর জন্মসঙ্গী মহানন্দা নদীকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেন। কেননা নিরবধিকাল বয়ে চলা মহানন্দা সমস্ত কিছুর নীরব সাক্ষী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে মহানন্দা নদীর নাম। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় যখন অত্যাসন্ন ঠিক সেরকম সময়ে ১৪ ডিসেম্বর মহানন্দার তীরে প্রাণ দিয়েছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর। কবি সেই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় পঙক্তিতে সাজিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের বলিষ্ঠ কাঁধ বেয়ে আসছে স্বাধীনতা—

> তারপর সাতচল্লিশ মাড়িয়ে একাত্তর; ক্যাপটেন জাহাঙ্গীর—
> বীরবংশের উত্তরাধিকার বুক দিয়েছে মহানন্দায়।
> ওই তো রেহাইচরের ঘাট! মহানন্দায় সেতু—
> জাহাঙ্গীরের প্রশস্ত কাঁধ হাত বিছিয়ে দু'পাড়ে—
> আর দৃপ্ত পায়ে পার হয়ে আসে স্বাধীনতা! (আমিনুল, ২০০৪ : ৬৪)

মহানন্দা ছাড়া কবির স্মৃতির নদী করতোয়াকে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় সুবিস্তৃত চলনবিলকে। কবির প্রকৃতিমুগ্ধতা, রূপমুগ্ধতার স্বাক্ষর বহন করছে *কুয়াশার বর্ণমালা* কাব্যের নাম কবিতাটি। কবির রোম্যান্টিক মানসের ছায়া পড়েছে কুয়াশার প্রচ্ছদে: "উন্মুক্ত চলনবিল, বাতাসে ডানার ধ্বনি/ আর জলজুড়ে মুগ্ধতার ছবি।" প্রেমের প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে করতোয়া নদীর নাম। কখনো নিরাশার দোলায় আবার কখনো আশার আশ্রয়ে আশ্বস্ত কবি আলম্বন বিভাবরূপে ব্যবহার করেছেন করতোয়াকে।

তাঁর প্রেমের কবিতায় রাজশাহী এবং বৃহত্তর বরেন্দ্রভূমি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে নান্দনিক সুচারুতায়। তিনি প্রেয়সীর অধরকে তুলনা করেছেন কাকনহাটের আঠালো লাল মাটির সাথে যা উপমা হিসেবে অভিনব, সুন্দর এবং অভূতপূর্ব।

যদি আবারও বলি, তোমার ঠোঁট মানে
কাকনহাটের চিররাঙা মাটি
এক চুমুতেই কাদা,
সোমরসের বাটি; (আমিনুল, ২০০৪ : ২৫)

তিনি বরেন্দ্রীর নারীকেই পৃথিবীর সেরা নারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বরেন্দ্রীর নারীরাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রেমময়ী, স্নেহময়ী এবং সুসংসারী বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর কবিতায়। তাই সারা জগৎ ভ্রমণ শেষে তিনি বরেন্দ্র-নারীর পবিত্র আঁচলেই সংসারের আসন পাতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন—

বারঘাটের কানাকড়ি—নষ্টচন্দ্র বলুক সকলে
তুমি আনো রাহুমুক্তি, মুখ ঘষি পবিত্র আঁচলে। (আমিনুল, ২০১৭ : ৩৯৭)

বাংলার নদীগুলোই বাঙালির প্রাণের কথা বলে। নদীই বাঁচিয়ে রেখেছে এ জনপদ। ভাটিতে অবস্থিত বলে বরেন্দ্রর পানিশূন্য অবস্থা দিন দিন চরমে পৌঁছে যাচ্ছে। বরেন্দ্রীর নদীর করুণ কান্না অন্যত্র প্রকাশিত হলেও কবির কাছে নদীর যে শরীরী রূপ ধরা দিয়েছে তা অনন্ত প্রকৃতির ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। দেবতার আশীর্বাদ রূপেই বহমান পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। কবির শৈশবে মাতাল আনন্দের বহমান মহানন্দা বর্তমানে শীর্ণতোয়া, এখন সেখানে—"মৌরসী নালার জলে বৃক্ষের ঠোঁট স্নান করে কাক।" নদীভাঙন, গ্রীষ্মের দাবদাহ, খরা ও অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবন এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করেই টিকে আছে এ জনপদের মানুষ। নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস, গ্রীষ্মকালে নদীতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি না থাকায় উত্তরবঙ্গ মরুর বৈশিষ্ট্য লাভ করছে ধীরে ধীরে। বরেন্দ্রের দুঃখময় করুণ দীর্ঘশ্বাস বাণীরূপ লাভ করেছে তাঁর কবিতায়—

নিদাঘের অগ্নিসখা লাঙ্গুল-অনলে দহে যায়
শুষ্কপ্রাণ বৃক্ষের বাকল;
তেতে ওঠে বরেন্দ্রজমিন।
হতাশ শ্যামার চোখে
ফিলিস্তিনের মতন স্বপ্ন পুড়ে যায়; (আমিনুল, ২০০৪ : ১৭)

বরেন্দ্রর উজানে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ গৌড়জনের মরণফাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাটির নদীগুলোর করুণ মুমূর্ষু অবস্থা এখন চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ দুঃখের করুণগাথা ইঙ্গিতাত্মক কথায় তুলে ধরেছেন কবি—

অপয়ার খরা আজ চেয়ে দ্যাখো পৈথানসোপানে
অবিবেকী জ্যেষ্ঠহাত টিপে ধরে টুঁটি
বিচারের বাণী কাঁদে মৌমাছির গলা ধরে আমের বাগানে
জল ও জীবন নিয়ে ভীষণ ভ্রুকুটি। (আমিনুল, ২০০২ : ২৮)

নদীভাঙন বাংলাদেশের মতো নদী প্রধান দেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গেও এ সমস্যা প্রকট। প্রমত্তা পদ্মার সর্বনাশা ভাঙনের শিকার হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিস্তৃত অংশ, সর্বস্ব হারিয়ে ফতুর হয়েছে অনেক পরিবার। বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হবার যন্ত্রণা-বেদনা কেবল তারাই প্রকৃতরূপে অনুধাবন করতে পারেন, যারা এর নির্মম শিকার হয়েছেন। কবি ভারতচন্দ্রের পাঠকগণের নিশ্চয় স্মরণে থাকবে, "নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না।" এই চরম সত্য নদী ভাঙনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। গ্রাম নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নদীর পেটে ঠাঁই হচ্ছে স্মৃতি ও সম্পদের:

পদ্মার আগ্রাসনে ছিন্ন-ভিন্ন আজ পুরাতন জনপদ
না-থাকার সমান হয়ে মুছে গেছে কাঁসারিপাড়ার নাম

ধর্মবিশ্বাসের মতো খসে পড়ছে জামে মসজিদের ইটগুলো
দিশেহারা ইমাম মানুষের পাপে খোঁজে ভাঙনের শানে নযুল। (আমিনুল, ২০০২ : ৩৮)

বরেন্দ্রভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতবেষ্টিত। এখানকার মানুষের ভাগ্য, জীবন জীবিকার অনেকটা সীমান্ত সংশ্লিষ্ট। সীমান্ত বাণিজ্য এর উল্লেখযোগ্য একটা দিক। অন্যদিকে আছে এ অঞ্চল থেকে ওদেশে চলে যাওয়া আমাদের স্বজন এবং ওপার থেকে এপারে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে আসা দেশত্যাগী মানুষ। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবের বিষয়টি এই ধরনের অভিবাসনের পেছনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। সাতচল্লিশে ধর্মের গজকাঠিতে মেপে দেশভাগ হয়েছে। গৌড়ের কিছু অংশ বর্তমান ভারতের অন্তর্ভুক্ত। এখন দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের টানাপোড়েন, অমীমাংসিত সীমান্ত সংঘর্ষ সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এ জনপদের মানুষের ভাগ্য। তাই কূটনৈতিক সম্পর্কের স্পর্শকাতরতা এড়িয়ে কবি লিখেছেন:

দ্যাখো, হাতনাগালে প্রতিবেশী আমরা গৌড়জন
একফালি জমিন—
মাঝখানে আ'ল উঠে হয়েছে দু'ফাঁক
শোনা কথা, নিপীড়িতা পিতামহী নাকি
মুগ্ধ হয়ে নিয়েছিলো দ্বিতীয় শরণ;
মৌরসি নালার জলে পাকুড়ের ঠোঁট, ম্লান করে কাক। [...]

আইল থেকে ধবলীকে আনতে যায় আমাদের কিশোর রাখালে,
ফিরে আসে বাঁশিহাতে রাখালের লাশ, ধবলী ফেরে না। (আমিনুল, ২০০২ : ৫৩)

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারতের অকৃপণ সাহায্য আমরা পেয়েছি। সে-সময় বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি উদ্বাস্তু মানুষকে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে ভারত। সে-বিষয়ে বরেন্দ্রজনের হৃদয়ের নম্রতা, উদারতা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। বরেন্দ্রের মানুষের সহনশীলতা ও হৃদয়ের বিশালতার কাছে সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা নিঃসন্দেহে চিন্তকদের লজ্জায় ফেলে দেবে। একাত্তরের ঋণে বাঁধা আছি আমরা। আমাদের পাওয়া না পাওয়ার বেদনা আছে, আছে বিপন্নতা। তবু বৈরিতার কলুষে তা কখনো আত্মগোপন করেনি। আমিনুল ইসলামের কবিতা সেই সত্যের সাক্ষ্য দেয়:

সত্যপাঠ এই যে-তুমিই
ঝরনাদলের খোয়াড় বানিয়ে
মেঘের পায়ে শেকল পরিয়েছো
এবং মৌসুমের কারাগার
সেও তোমারই রচনা।

আমার উঠোনভরা বিপন্নতা,
অথচ জন্মদাগে চুম্বন দিয়ে
আজো তোমাকে পুরোনো সম্বোধনে ডাকি। (আমিনুল, ২০০৯ : ১৭)

সীমান্তে বসবাসকারী বরেন্দ্র অঞ্চলের কিছু মানুষের ব্যবসায়িক বৃত্তিতে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়। এদের কারণে সামাজিক মূল্যবোধেও ধ্বস নামে। এই সামাজিক সত্যের উদ্ভাসন রয়েছে আমিনুল ইসলামের কবিতায়—

বর্ডারের কারবারে বাধা দিয়া জেলে গ্যাছে
ঘুটনিপাড়ার রফিক মাস্টার,
আর মোটা কামাই লিয়া শহরে গ্যালো রশীদ বেলাকী। (আমিনুল, ২০০২ : ৩৮)

বরেন্দ্রের মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ, তাই ভূমি তাদের প্রধান সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে নিয়োজিত তারা। প্রকৃতি বিরূপ হলে এর নির্মমতার সবচেয়ে বড় শিকারে পরিণত হয় তারাই। অনাবৃষ্টি ও খরা এই কালো কালো শস্যের শিল্পীদের নিকট তাই বড় অভিশাপরূপেই ধরা দেয়। তাই তাদের বৃষ্টির জন্য প্রার্থনাও আন্তরিক, শুদ্ধ হৃদয়ের করুণ রসে দ্রাব তাদের হাহাকার:

আরও দাহ আরও দাহ বলে নিদাঘের বরেন্দ্র-মৃত্তিকা
সবুজের শীর্ণ বোতাম খুলে সূর্যের কাছে মেলে ধরে
শুষ্ক অন্তরতল; উচ্চারিত মন্ত্রের মতন শস্যের শিল্পীর
মিনতি ছড়িয়ে পড়লেও ভাঙনকে আমন্ত্রণ জানাতে
আষাঢ়ের নদীতীর আলগা করে দেয় শেকড়গাঁথা
শরীরের ভাঁজ; (আমিনুল, ২০০৯ : ৬০)

চৈত্রে বরেন্দ্র তার মাটি ফাটা বুক দেখায়। বরেন্দ্রের কিছু এলাকার মাটি লাল রঙের কিন্তু এ-সময় পুড়তে পুড়তে কালো পাথরের রঙ ধরে। বৈশাখের প্রথম ধারাবর্ষণে উত্তপ্ত মাটি থেকে লকলকিয়ে ওঠে বৃষ্টিস্নানের আনন্দ। বাতাসে ভেসে আসে মাটির সোঁদা গন্ধ। নৈসর্গিক এই ছবি কবি এঁকেছেন—

নিচে মাতাল নিঃশ্বাসে সুনিবিড় পানোৎসব,
ভেজাহাতের পরশ নিচ্ছে পোড়াশরীর;
মাটির নরমে পরম পুলকের শিহরণ
গা মুচড়িয়ে ধরতে চায় আকাশকে; (আমিনুল, ২০০২ : ৫৭)

লাঙল, গরু, কাস্তে, কোদাল নিয়ে সারাবছর মাঠের ব্যস্ততা এ অঞ্চলের কৃষকের। দেশের খাদ্যের যোগানদাতা তারা, কিন্তু নানা ছুতোয় কমছে তাদের জমি, গ্রাসিত হচ্ছে বড় কৃষকদের দ্বারা, বর্তমান বরেন্দ্রের চিত্র এই। কখনো উন্নয়নের নামে, কখনো দেনার দায়ে হারাচ্ছে তারা শেষ সম্বলটুকু—

আজীবন হালচষা, চৌদ্দপুরুষের ক্ষেতে
আগাছা নিড়িয়ে রোপা সুগন্ধের শস্য,
আর চোখের সামনে উপেনের ভিটেটুকু বেদখল আজ। (আমিনুল, ২০০২ : ৫৬)

ধান আর প্রাণ সমার্থক বরেন্দ্রবাসীর নিকট। হেমন্তে নতুন ধান ওঠে, ক্ষেত থেকে যায় ঘরে। রাশি রাশি ধান, গরু-মহিষের গাড়িতে স্তূপে স্তূপে, সারি বেঁধে যায় গাড়ি—ফসল ওঠানোর সময় এ দৃশ্য বরেন্দ্রভূমির মাঠ-প্রান্তরের। এ-কেবল ধান নয়, গরুরগাড়ি বোঝাই ধানরূপ স্বপ্নের যাত্রা বরেন্দ্রের কৃষকের ঘরে ঘরে। সোনার ধানের সোনার স্বপ্নের রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বরেন্দ্র-প্রান্তর:

ধানকাটা ক্ষেতে বসে আছি পা ছড়িয়ে; পিঠঘেঁষে
আয়ড়ার মোড়; গাঁয়ে গাঁয়ে পথের মিতালী;
ডানপাশে রাজশাহী–আমনুরা সর্পিল সড়ক
সাঁই–সাঁই যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, মিশুক,
হেমন্তের সোনাবোঝাই মহিষের গাড়ি,
গেরস্তগতি মানুষটানিত তিন চাকার ভ্যান;
এমত দৃশ্য নিয়ে এই আমাদের আয়ড়া—
বরেন্দ্রভূমির একচিলতে রাঙা উঠোন। (আমিনুল, ২০০৪ : ৫৮)

বরেন্দ্রভূমি একইসঙ্গে বাংলার ঐতিহ্যভান্ডার এবং শস্যভান্ডার। বরেন্দ্রভূমির মাটির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা অনিঃশেষ। সেজন্য স্মরণাতীতকাল থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এসে আবাসন গড়েছে বরেন্দ্রভূমির সচ্ছল উঠোনে। ধান, পাট, মসুর, মাষকলাই, মাছ, আম , জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, কলা ইত্যাদি ফলে-ফসলে আজ ভরপুর বরেন্দ্রভূমি। বরেন্দ্রভূমিতে প্রাচীন মানবসভ্যতা গড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান কারণ এর ফল-ফসলের প্রাচুর্য। আমিনুল ইসলামের কবিতায় বরেন্দ্রভূমির এমন ছবি ফুটে উঠেছে বারবার—

তথাপি লালমাটির গন্ধ যদি পাখনা জড়িয়ে কাঁদে,
আর বলে—চলো আরো একবার সোমপুর বিহারের কোলে
চড়ুইস্নানের মতো মেখে আসি জীবনের রঙ—
যেখানে হেমন্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে রয়েছে জননীর অফুরন্ত হাসি, (আমিনুল, ২০১৯ : ২৮৭)

বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বরেন্দ্রর যোগ সুপ্রাচীন কালের। নওগাঁ তথা বরেন্দ্রের পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সেই সংস্কৃতির উজ্জ্বল বাতিঘর। শিক্ষার আলোক ও মৈত্রীর বাণীবাহী বিহার আমাদের পূর্বসূরিদের অগ্রসরতার সাক্ষ্যবাহী। পাল আমল থেকে বরেন্দ্রে ধ্বনিত হয়েছে বুদ্ধের বাণী:

বদলগাছীর রোড ধরে উঠে আসে মহাকালের গান:
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—
ধম্মং শরণং গচ্ছামি—
সংঘং শরণং গচ্ছামি;
পেছনে শ্রীজ্ঞান অতীশের ছায়া। (আমিনুল, ২০০৪ : ১৬)

প্রাচীন জনপদ হওয়ার কারণে বরেন্দ্রে দেখা মেলে বেশ কিছু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর। এরাই এ ভূমির আদিবাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তারাই এ জঙ্গলাকীর্ণ রুক্ষ প্রান্তকে শস্যময় শ্যামল করে তুলেছিল। সাঁওতাল, ওঁরাও, কোচ, মাহাতো, রাজবংশীদের কথা বাদ দিয়ে বরেন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। কৃষিকাজ, শিকার তাদের পেশা। মাদলের দ্রিম দ্রিম বাদ্যের তালে তালে নৃত্য, আর মহুয়া, তালের রস (তাড়ি) তাদের নিত্যদিনের জীবনের অংশ। কবি খুঁজেছেন তাঁর পরিচয়-সূত্র তাদেরই মাঝে—

এবং উদাস দুপুরে খুঁজে ফিরি
আমাদের অস্ট্রিক আত্মীয়ের পদচিহ্ন—
যে তার যুবতীকে নিয়ে
বরেন্দ্রীর শিমুলচিহ্নিত ইতিহাসের রাঙাপ্রান্তরে লুকিয়ে আছে। (আমিনুল, ২০০৯ : ২২)

বরেন্দ্রভূমির আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব জীবনধারা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একদিকে তারা ভূমি হারিয়ে নিঃস্ব, অন্যদিকে জীবিকার সংকটও রয়েছে। তাদের দারিদ্র্যকে পুঁজি করে যেমন এনজিওরা সুযোগ নিচ্ছে, তেমনি সুযোগ নিচ্ছে ধর্ম-প্রচারকরা। এ বাস্তবতার বাণীচিত্র রচনা করেছেন আমাদের আলোচ্যমান কবি—

এইখানে সবকিছুই মাঠের উপমা আজও;
তবুও মুছে যায় বাহা সহরাই ও নবান্ন।
ইটভাটার মতন উঠছে গীর্জা এক, দুই, তিন [...]
কালোবধূ এবং রাজবংশী যুবার হাত ধরে
সকাল-সন্ধ্যা গীর্জায় নিয়ে যায় রোজ
নিতাই ঘটকের মতন গুটিকয় এনজিও। (আমিনুল, ২০০৪ : ৫৮)

বরেন্দ্রর মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই নিরীহ কিন্তু তারা ভীতু নয়; পলায়নপরতা নেই তাদের মধ্যে। শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রবাসী গর্জে উঠেছে বারবার। আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এ জনপদের। সত্যভ্রষ্ট নন বলেই কবি সেই ঐতিহ্যিক গৌরবে উদ্বোধিত হয়েছেন—

অগ্নিদিনের কথা উঠলে এখনও আমার
পিতার চোখ টর্চলাইটের মতন জ্বলে উঠে
আছড়ে পড়ে জমে ওঠা আঁধারের গায়ে!
সফল-সংগ্রামীর শোণিত বয়ে আমিও স্ফীতবুক; (আমিনুল, ২০০৪ : ১১)

বিস্মৃতিপ্রবণতার দুর্নাম প্রায় অমোচনীয় কালিতে লেখা হয়ে গেছে বাঙালির ললাটে, শেকড়ের খোঁজ রাখতে বিমুখতাও প্রবাদপ্রতিম। নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাই বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এসব নিয়ে লোক-কবিরা গান-গাঁথা রচনা করলেও আধুনিক সাহিত্যের কোনো আঙ্গিকে তেমনভাবে উচ্চকিত হয়নি এসব ঐতিহাসিক ঘটনা। দু-একটা নাটকের কথা বাদ দিলে তেমন উজ্জ্বল সৃষ্টি চোখে পড়ে না। বরেন্দ্রের সম্পৃক্তি রয়েছে এমন দুটি আন্দোলনের কথা কবি আমিনুল ইসলামের কবিতায় উঠে এসেছে। কৃষক বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলনকে স্মরণ করেছেন কবি:

১.
ও পাশে দুবলহাটির বাতাসে চড়ে ভেসে আসে আস্তানমোল্লার কণ্ঠ:
'না! আর খাজনা বৃদ্ধি নয়, তোমার জুলুম আর সইবো না রাজা!'
ষাট সহস্র কৃষকের গলা সমুদ্রগর্জনের মতো ফুঁসে ওঠে পেছনে: না! না! না! (আমিনুল, ২০০৪ : ১৬)

২.
নাগরী বাড়ায় হাত, ডুগি ফেলে মালকোঁচায় পালায় আলকাপ
শত ছুঁমন্তরে উধাও বাহা সহরাই
ইলা নেই রাঙাপথে, তেপান্তরে বেড়েছে সন্তাপ
নানা নাতি কত আর পোড়াকণ্ঠে গাই? (আমিনুল, ২০০২ : ২৮)

বরেন্দ্রভূমির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে বর্তমান বগুড়া—যেখানে অতীতে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্র সভ্যতার রাজধানী পুণ্ড্রনগর যা পরবর্তীতে মহাস্থানগড় নাম ধারণ করে। পুণ্ড্রনগরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস ও কিংবদন্তি। বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রীয় নদী করতোয়ার তীরে গড়ে উঠেছিল এই শহর ও সভ্যতা। প্রকৃতিপূজক, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম-অনুসারী মানুষ এ ভূমিতে বসবাস করেছে এবং প্রাধান্য লাভ করেছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রচলিত কিংবদন্তি হতে জানা যায়, লখিন্দরের পিতা এবং বেহুলার শ্বশুর চাঁদ সওদাগরের বসবাস ছিল পুণ্ড্রনগরে। এখানে ভ্রমণে এসেছিলেন চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীসহ বহু কবির বসবাস ছিল পুণ্ড্রনগরে। বাংলাভাষার প্রাথমিক বিকাশে পুণ্ড্রনগরীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ঐতিহাসিক চলনবিল পুণ্ড্ররাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বরেন্দ্রীর কেন্দ্রীয় নদী করতোয়ার আদি নাম ছিল সদানীরা। বহু ধর্মের, বহু রাজার উত্থান-পতনের লীলাভূমি পুণ্ড্রনগর যা আজকের বরেন্দ্রীর বগুড়া। আমিনুল ইসলাম তাঁর 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' শীর্ষক দীর্ঘকবিতায় বরেন্দ্রভূমির প্রাণকেন্দ্র পুণ্ড্রনগরীর ইতিহাস-ঐতিহ্য-কিংবদন্তিকে তুলে ধরেছেন বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

চলনবিলের চাতাল ছাড়িয়ে আমরা এসেছি প্রত্নরাজপথ; পথের পাশে
ছিল সদানীরার পাড়—স্রোত ছিল আঁকাবাঁকা; বাতাসে উতলা ছিল

> শাল্মলী বৃক্ষের মিছিল; এই যে আজকের সুরম্য শহর—একদিন এখানেই
> গড়ে উঠেছিল সভ্যতার মাতৃঘর পুণ্ড্রনগর—সেদিনের অন্ধকার পৃথিবীর
> লাইট হাউস। রামচরিতের কবি এসে নেমেছিলো এখানেই—তার কাছে
> বাংলা-মা'র হাতে খড়ি–স্বরে অ স্বরে আ ই ঈ। [...]
>
> তবুও হায় মাৎস্যন্যায়! অতঃপর গোপালের সোনালি সুদিন। পশ্চিমে
> 'বিভেদের বৈদিক আগুন' ডেকে আনে তুর্কীদের সাম্যের বিজয়; সে-সূত্রে
> পুণ্ড্রবাসী নতুন অধ্যায়ে রাখে পা—আর সদানীরা হয়ে যায় মুগ্ধ করতোয়া। (আমিনুল, ২০১০ : ৬২)

একসময় বাংলাদেশে গৌরবময় সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন বৌদ্ধ রাজা ও সম্রাটগণ। উয়ারী বটেশ্বর ময়নামতি, মহাস্থানগড়, সোমপুর বৌদ্ধবিহার সবখানে সেই সোনালি সভ্যতার উজ্জ্বল ছাপ জ্বলজ্বল করে আজো জ্বলছে। তাঁর 'পিছিয়ে যাওয়া মানুষ', 'ব্লু মাউন্টেনে দাঁড়িয়ে', 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি', 'তুমি হলে সন্ধ্যাবতী সকলি কবুল', 'বনভোজন', 'ভোরের হাওয়ায় ভাসে বাংলাদেশ' এবং এমন আরও অনেক কবিতায় বৌদ্ধ রাজা ও সম্রাটদের কথাসহ বৌদ্ধ সভ্যতার নানা অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে। তিনি অতীতের সোনালি দিনকে তুলে এনেছেন, বর্তমানের হতাশা অবক্ষয়চিত্রের বিপরীতে। বৌদ্ধ সম্রাটদের আমলে বরেন্দ্রভূমির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে গড়ে উঠেছিল বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সোমপুর বিহার। পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের (৯৮২-১০৫৪) মতো মনীষীগণ এখানে এসেছিলেন পাঠদান করতে। আল মাহমুদের *সোনালি কাবিন* শিরোনামার সনেটগুচ্ছে সেই সভ্যতা ও অতীশ দীপঙ্করের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমিনুল ইসলামও সোমপুর বিহারের ছবি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। তাতে বিহারকেন্দ্রিক জ্ঞানের সাধনা, সেই জ্ঞানের বিদেশে প্রসার, প্রেম, কিংবদন্তি, ইতিহাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ অঙ্গীভূত দেখতে পাওয়া যায়:

> কথায় কথায় আমরা এসে গেছি পাহাড়পুর। পাহাড় নেই,
> পর্বত নেই; আছে শুধু পাহাড়সমান অতীতের সোনালি গৌরব।
> এখানে এলেই ঘাড় হতে নেমে যায় বোঝা; যখন দিনের আসনে
> অন্ধকারের পা, তখন এখানেই জ্বলে উঠেছিল নাক্ষত্রিক দীপের
> মশাল; বাতিওয়ালার দল সে মশাল হাতে পাড়ি দিয়েছিল (আমিনুল, ২০১০ : ৬২)

পালবংশের রাজাগণ বরেন্দ্র অঞ্চলে বহুদিন রাজত্ব করেছেন। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ও পীড়নের অভিযোগ ছিল। বরেন্দ্রের কৈবর্তগণ (জেলে সম্প্রদায়) মহীপালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে। লড়াইয়ের মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে কৈবর্তগণ বাংলার সিংহাসনে বসেন। সেটিই অনার্য বাঙালির গুরুত্বপূর্ণ উত্থান এবং অন্যতম গৌরবময় স্বশাসনের উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কৈবর্তরাজ দিব্যক সে বিজয়কে দৃশ্যমানতায় ধরে রাখার জন্য বিশাল দিঘির বুকে মূল্যবান ধাতুর স্তম্ভ নির্মাণ করেন, যা আজও দিব্বক স্তম্ভ নামে নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় অটুট রয়েছে। কৈবর্তদের রাজত্বকাল বেশি দিন স্থায়ী হয়নি কিন্তু সেটি অনার্য বরেন্দ্রবাসী বা সাধারণ শ্রেণির বাঙালির নিকট গৌরবময় শাসনকাল বলে পরিগণিত হয়। আমিনুল ইসলাম তাঁর কবিতায় এই বিষয়টি কাব্যদক্ষতায় উপস্থাপন করে বরেন্দ্রবাসী তথা অনার্য বাঙালির ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

> দ্যাখো আজ সোমপুর বিহারে সবুজ সংকেত হয়ে জমে ওঠে
> বনভোজনের দিন! এসো আমরা দু'জনে রচি এ-শতকের
> গন্ধেশ্বরীর ঘাট। (আমিনুল, ২০১০ : ৬০)

আমিনুল ইসলামের কবিতা পাঠান্তে মনে হয় তিনি একজন সার্বক্ষণিক বরেন্দ্রপ্রাণ মানুষ। তাঁর জাগরণে এবং স্বপ্নে বরেন্দ্রভূমির জন্য অনিঃশেষ ভালোবাসা। তিনি প্রেমের কবিতায়, রাজনীতিঘেঁষা কবিতায়, প্রকৃতিপ্রধান, ভ্রমণ বিষয়ক কবিতায়—এককথায় সবধরনের কবিতায় বরেন্দ্রভূমি ও বরেন্দ্রসভ্যতার ঘ্রাণ ছিটিয়ে দেন। তিনি বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত কবিতায় বিদেশের মাটির সঙ্গে বরেন্দ্রমাটির সেতু রচনা করেন।

> হিমের পাহাড় লুট করে নেয় বাতাসের তাবৎ উষ্ণতা
> পক্ষপুটের পুঁজিটা তবু ধরে রাখে ক্ষুদ্র পেঙ্গুইন
> আমরা ঘুরছি মালয় হয়ে মেলবোর্ন সিডনি ও সুমাত্রা
> আমাদের বুকে পদ্মাপাড়ের কয়েকগুচ্ছ বরেন্দ্রদিন। (আমিনুল, ২০১৭ : ২১৯)

আমিনুল ইসলামের কবিতায় গৌড়-বরেন্দ্রর কথা নানা প্রসঙ্গেই ঘুরেফিরে এসেছে। আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতার কারণেই কবিতায় বর্ণনার সুযোগ সীমিত। ইঙ্গিতে, দু-একটি শব্দের রেখায় ফুটিয়ে তুলতে হয় কবিতার কারুকাজ। আমাদের আলোচ্যমান কবি তাঁর কবিতায় গৌড়-বরেন্দ্রের ভূ-প্রকৃতি, নিসর্গ, মানুষ, তার যাপিত-জীবন, লোক-ঐতিহ্য, ইতিহাস, কিংবদন্তি, নৃতত্ত্ব-ভাষা সবদিকেই সন্ধানী আলো ফেলেছেন। তাই তাঁর কবিতায় অতীত-বর্তমানের গৌড়-বরেন্দ্রকে ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ আবিষ্কার করা যায়। তাঁর কবিতায় বরেন্দ্রভূমির নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ, শব্দে-চিত্রকল্পে-উপমায় জায়গা করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাচীন এই জনপদটির অতীত গৌরব ও উদ্দীপ্ত বর্তমানকে খুঁজে পাওয়া যায়।

সহায়কপঞ্জি

আমিনুল ইসলাম (২০০২)। *তন্ত্র থেকে দূরে*। শ্রাবণ, ঢাকা।
—— (২০০৪)। *মহানন্দা এক সোনালি নদীর নাম*। টিমওয়ার্ক পাবলিকেশন, ঢাকা।
—— (২০০৯)। *কুয়াশার বর্ণমালা*। মুক্তদেশ, ঢাকা।
—— (২০০৯)। *শেষ হেমন্তের জোছনা*। মুক্তদেশ, ঢাকা।
—— (২০১০)। *পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি*। গতিধারা, ঢাকা।
—— (২০১৭)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা।
—— (২০১৯)। *বাছাই কবিতা*। অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।
—— (২০২৩)। *মহানন্দা থেকে মধুমতী*। বটেশ্বর বর্ণন, ঢাকা।
আল মাহমুদ (২০১৯)। *কবিতাসমগ্র -১*। অনন্যা, ঢাকা।
নীহাররঞ্জন রায় (১৪০০)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব*। প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা।